সংশপ্তকের জন্যে জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার)

‘হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল’। মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য আবহে হাসি আনন্দে ভরা পরিবারে বেড়ে ওঠা এক নারীর অকস্মাৎ সব স্বজন হারিয়ে সর্বহারা হয়ে যাওয়া, সেই অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানো এবং অবশেষে দিগন্তবিস্তরী মহিমায় ১৭ কোটি মানুষের ত্রাতা হিসেবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার গল্প নিয়ে এই ছবি।

পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর আপন দেহভস্ম থেকে গ্রিক পুরাণের ফিনিক্স পাখির পুনরুত্থান, এই গল্প যেন সেই পৌরাণিক আখ্যানের বাস্তব প্রকাশ। যেন এক জাদুবাস্তবতা নির্ভর পরাবাস্তব গল্প। এই ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় দিক হলো, এখানে একেবারে হারিয়ে যাওয়ার মত পর্যায় থেকে স্বমহিমায় যাঁর ফিরে আসার গল্প বলা হয়েছে, তিনি নিজেই সেই গল্পের মূল কথক। তিনি হলেন, বাংলার ‘ফিনিক্স পাখি’, বিশ্বনন্দিত রাজনীতিক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর সেই মহীয়সী নারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন। এই ঐতিহাসিক উচ্ছাসের মুহূর্তে লেখাটি শুরু করেছি। ‘হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল’ ছবিতে আত্মকথনের একপর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা বলেন, ১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল তাঁরা দুই বোন দিল্লির নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরগায় গিয়েছিলেন। সেখানে একজন খাদেম অনেক পুরনো একটা খাতা এনে তাঁদের সামনে মেলে ধরলেন। সেই খাতায় বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর। তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৪৬।

ওই প্রামাণ্যচিত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘দেখলাম তারিখটা ৯ এপ্রিল। ১৯৪৬ সালে আব্বা ওখানে গিয়েছিলেন। আর আমি গেলাম ৮১ সালের ৯ এপ্রিল। ৪৬ সাল, আমার জন্মের আগে উনি গিয়েছেন। আর আমি পাচ্ছি ৮১ সালের একই তারিখ। তখন আমার মনে একটা সাহস এল। মনে হলো আমাকে যেতে হবে। মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। বোধ হয় এই বার্তাটাই আমি পাচ্ছি।’

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ছিলেন। নিয়তি নির্ধারিত সেই অনুপস্থিতি সেদিন তাঁদের গণহত্যা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বিদেশে বসে জানলেন, তিনি আক্ষরিক অর্থে এতিম হয়ে গেছেন।

ব্রাসেলস থেকে প্রথমে জার্মানিতে ও পরে ভারতে এসেছিলেন। দিল্লিতে থাকার সময় খুনিরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করছিল। আত্মরক্ষার্থে তখন দিল্লিতে দুই বোনকে নাম-পরিচয় পর্যন্ত গোপন করতে হয়েছিল। কিন্তু দেশে ফেরার ইচ্ছা তাঁকে তাড়া করে ফিরছিলো। তিনি জানতেন, দেশে ফেরার পর তার পায়ে পায়ে বিপদ থাকবে, কিন্তু সেই বিপদকে সরিয়ে দেশবাসীকে স্বৈরাচারমুক্ত করতেই হবে। ফলে পরের মাসেই, অর্থাৎ ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশের মাটিতে পা রাখেন তিনি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা যেন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঘটনারই এক পুন:মঞ্চায়ন। ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে বঙ্গবন্ধুকে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, যুদ্ধে সব শেষ হয়ে যাওয়া দেশে ফিরে তিনি কী করবেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার দেশের মাটি আছে, আমার জনগণ আছে। আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব’। মানুষ এবং মাটিই যে তাঁর শক্তির উৎস ছিল দেশবাসী সেটি জানতেন, সেদিন তিনি তা বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বঙ্গবন্ধুকেই ধারণ ও বহন করে চলেছেন, যত দিন যাচ্ছে তত তা স্পষ্ট হচ্ছে।

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা যখন দেশের মাটিতে পা রেখেছেন, সে মুহূর্তে ঘাতকেরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসন দখল করে আছে। ‘জয় বাংলা’, ‘বঙ্গবন্ধু’-এ শব্দগুলো তখন নিষিদ্ধ পংক্তিমালা। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জাতিকে কলঙ্ক থেকে মুক্ত করেছেন। দীর্ঘ যাত্রায় নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে, কারাভোগ করে, একাধিকবার গৃহবন্দী হয়ে, হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে গিয়ে তিনি চারবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড গড়েছেন।

প্রায় চার দশক ধরে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দিয়ে যাওয়া এই মহিয়সী ১৯৪৭ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন। মধুমতি নদী, বাঘিয়ার বিল আর বর্নির বাঁওড়ের জলকল্লোলস্নাত পরিবেশে শৈশব কেটেছে তাঁর। মাটি আর মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা। সেই কোমল মাটির মতো মানুষটিকে জাতির বৃহত্তর প্রয়োজনে কখনো কখনো কঠোর হতে হয়েছে। কোমলে-কঠোরে মিলে এক অনন্য চরিত্রে আজ তিনি জাতির স্বপ্ন ও আশার ধ্রুব নক্ষত্র।

বলা হয়ে থাকে, জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন ভিশনারি, আর তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন মিশনারি। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে একই কথা বলা যায়।

বঙ্গবন্ধুর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। প্রচলিত আছে তিনি কারও নাম শুনলে সচরাচর সেই নাম ভুলতেন না। দেশের কোথায় কী হচ্ছে তা বঙ্গবন্ধুর নখদর্পণে ছিল। সব খোঁজখবর তিনি রাখতেন। এই গুণগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে স্পষ্ট।

আমার মনে পড়ছে, ঢাকায় ক্যাসিনো বিরোধী অভিযানের অল্প কয়েক দিন আগে আমি তখন র‌্যাবের মহাপরিচালক হিসেবে একটা কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে ঢাকায় ক্যাসিনো থাকার কথা বললেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে তুমি কী করছ? তুমি এগুলো দেখছ না কেন?' আমি বেশ অবাক হলাম। তাঁর নলেজের বাইরে যে কিছুই নেই, সেটা আরও একবার উপলব্ধি করলাম।

আমি বললাম, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ব্রিটিশ আমলে প্রণীত জুয়া আইনটি খুব দুর্বল। তাছাড়া, প্রয়োগের বিষয়টা জেলার অধিক্ষেত্রে দেখেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর মেট্রোপলিটন এলাকায় এ বিষয়টি দেখেন পুলিশ কমিশনার। মানে জুয়া আইন বাস্তবায়নে সরাসরি র‌্যাবের তেমন কিছু করার নেই।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আমি যদি তোমাকে নির্দেশ দিই?' আমি বললাম, 'আপনি নির্দেশ দিলেতো আমি অবশ্যই করতেপারি- ইন নো টাইম'। পরে আমি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে র‌্যাবকে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিই। এর ফলে যা হলো, সেটি এই অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ এবং বাকিটা ইতিহাস।

এর কিছু দিন পরে র‌্যাবের 'রেইজিং ডে' ছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন। ওই সময় সুন্দরবনে জলদস্যু দমন অভিযানের কারণে আমরা জানতে পারি বঙ্গোপসাগরে ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ জাগতে শুরু করেছে। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গোপসাগরে নতুন কিছু দ্বীপ ভেসে উঠছে। আমরা আমদের কল্যাণট্রাস্টের জন্য কি এ রকম একটা দ্বীপ নিতে পারি, যেখানে বিদেশি পর্যটক ও দেশের মানুষের জন্য কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে'। তিনি তাঁর মোবাইল ফোন খুললেন। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি মোবাইলের স্ক্রিন আমার সামনে ধরে জেগে ওঠা দ্বীপগুলোর নাম ধরে বলতে লাগলেন, 'এই দেখ, এটা এই আইল্যান্ড, ওটা হলো ওই আইল্যান্ড।' দ্বীপগুলোর কোনটাতে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন, সেটাও তিনি বলে দিচ্ছিলেন। দেখলাম, তিনি ওই দ্বীপগুলো সম্পর্কে আগাগোড়া পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে বসে আছেন। আমি হতভম্ব ও হতবাক! দেশকে এগিয়ে নিতে হলে, আগে দেশকে ভালোভাবে জানতে হবে-এই সত্যটা তাঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি জেনেছি।

তাঁর অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার ফলে উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষের শব্দকোষ থেকে আজ 'মঙ্গা' নামের শব্দটি চিরস্থায়ীভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

আমি পুলিশের মহাপরিদর্শক হওয়ার পর যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ, পুলিশকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে হলে প্রশিক্ষণকে প্রাধান্য দিতেই হবে। তোমাদের মধ্যে র‌্যাংকের পরিবর্তন হলেই মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ হয়। এটা কিন্তু ঠিক না। বছরব্যাপীই কিন্তু তোমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান থাকতে হবে। সকল অফিসারসহ প্রতিটি সদস্যকে প্রতি বছরই প্রশিক্ষণে থাকতে হবে, সে যে র‌্যাংকেরই হোক না কেন।'

আমার আবারও চমকানোর পালা। দেখলাম, পুলিশ বাহিনীর অতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কেও তিনি বিশেষজ্ঞের মতো বলে যাচ্ছেন। প্রশিক্ষণ ছাড়া যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী এগোতে পারে না, সেটি তিনি কতোটা উপলব্ধি করেন!

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই পরামর্শের ধারাবাহিকতায় আমরা এ বছর ৫ সেপ্টেম্বর সকল র‌্যাংকের অফিসারসহ সব সদস্যের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছি। পুলিশ বাহিনী গঠন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত এটি একটি বিরল ঘটনা যে, সকল র‌্যাংকের সবার জন্য প্রতি বছর নিয়মিত প্রশিক্ষণ নেওয়ার যাত্রা শুরু হলো। এইভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঈর্ষণীয় প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে আসছেন।

৮০'র দশকে তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অনেকটা নতজানু হয়ে থাকতে হতো আমাদের। মাত্র ৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আমাদের তদানিন্তন অর্থমন্ত্রীদের প্যারিস কনসোর্টিয়ামের বৈঠকে দুর্বল চিত্তে হাজির হতে হতো। আজ আমাদের দেশ অন্যদের ২০০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ দিচ্ছে। সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ আজ যে উচ্চতায় উঠে এসেছে তার পেছনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূর প্রসারী ও সাহসী ভূমিকা প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্র শেখ হাসিনাকে নিয়ে আলোচনা হয়। ২০১৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদর দপ্তরে তাঁকে 'ভ্যাকসিন হিরো' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। নারী ও কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রসারে স্বীকৃতি স্মারক 'শান্তি বৃক্ষ' দেওয়ার সময় তাঁর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ইউনেসকোর প্রধান। তাঁকে 'সাহসী নারী' অভিহিত করে জাতিসংঘের এ সংস্থাটির প্রধান বলেছেন, 'নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বমঞ্চের জোরালো এক কণ্ঠ।' গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এসডিজি অগ্রগতিপুরস্কার'-এ ভূষিত করেছে। পুরস্কার প্রদানকালে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এসডিএসএন-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন কৌশলবিদ প্রফেসর জেফরি স্যাকস শেখ হাসিনাকে উন্নয়নশীল দেশের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন অব দি ডে' হিসেবে তুলে ধরেন, যা প্রতিটি বাংলাদেশী বাঙালির জন্য অত্যন্ত গর্বের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাকাব্যিক অর্জন ও সাফল্যগাঁথা কোন ছোট একটি প্রবন্ধে কিংবা পুস্তকে তুলে আনা অসম্ভব আস্পর্ধা। ১৯৯৬-২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ও গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি তাঁর সরকারের অন্যতম সাফল্য হিসেবে এখনো বিবেচিত হয়ে আসছে। দীর্ঘকাল ছিটমহলের বাসিন্দারা নাগরিকত্বহীন অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলেন। তিন বিঘা করিডরে সন্ধ্যা নামার আগেই সেখানে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হতো। স্বাধীনভাবে মানুষ নিজের ঘরে ঢুকতে পারত না। ভারতের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি করে, ছিটমহলগুলোকে মূল ভূখন্ডের সঙ্গে একীভূত করে সেই কষ্টের, সেই যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছেন শেখ হাসিনা।

বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত ও মধ্যম আয়ের আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। এর বাইরে তাঁর নেতৃত্বে 'ডেল্টা প্ল্যান' নামের একটি এক শ' বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা এগিয়ে চলছে। সড়ক যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা অভাবনীয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র উড়িয়ে দিয়ে তাঁর বজ্রকঠিন মনোবলের কারণেই আজ পদ্মা সেতু বাস্তবে রূপ নিয়েছে। মেট্রোরেল ও কর্ণফুলী ট্যানেলের মতো মহাপ্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন।

তিনি সাধারণ মানুষের অন্তরের কতটা গভীরে যেতে পেরেছেন তার প্রমাণ গফরগাঁওয়ের রিকশাচালক হাসমত আলী। হতদরিদ্র হাসমত আলী নিজের সব সঞ্চয় দিয়ে জমি কিনে তা শেখ হাসিনার নামে লিখে দিয়েছিলেন। অথচ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনো দিন দেখাই হয়নি।

এই রকম দেশের অগণিত হাসমত আলীর দোয়ার বরকতেই কমপক্ষে ১৯ বার হত্যাচেষ্টার হাত থেকে বেঁচে প্রধানমন্ত্রী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। ৭৫তম জন্মদিনের এই শুভ মুহূর্তে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন। তাঁর জন্য শুভাশীষ- শতায়ু হোন সংশপ্তক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

লেখক-
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ।
প্রথম আলো, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠসহ অন্যান্য দৈনিকে প্রকাশিত

রাজশাহী রেঞ্জ

রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, রাজশাহী

একনজরে রাজশাহী বিভাগ

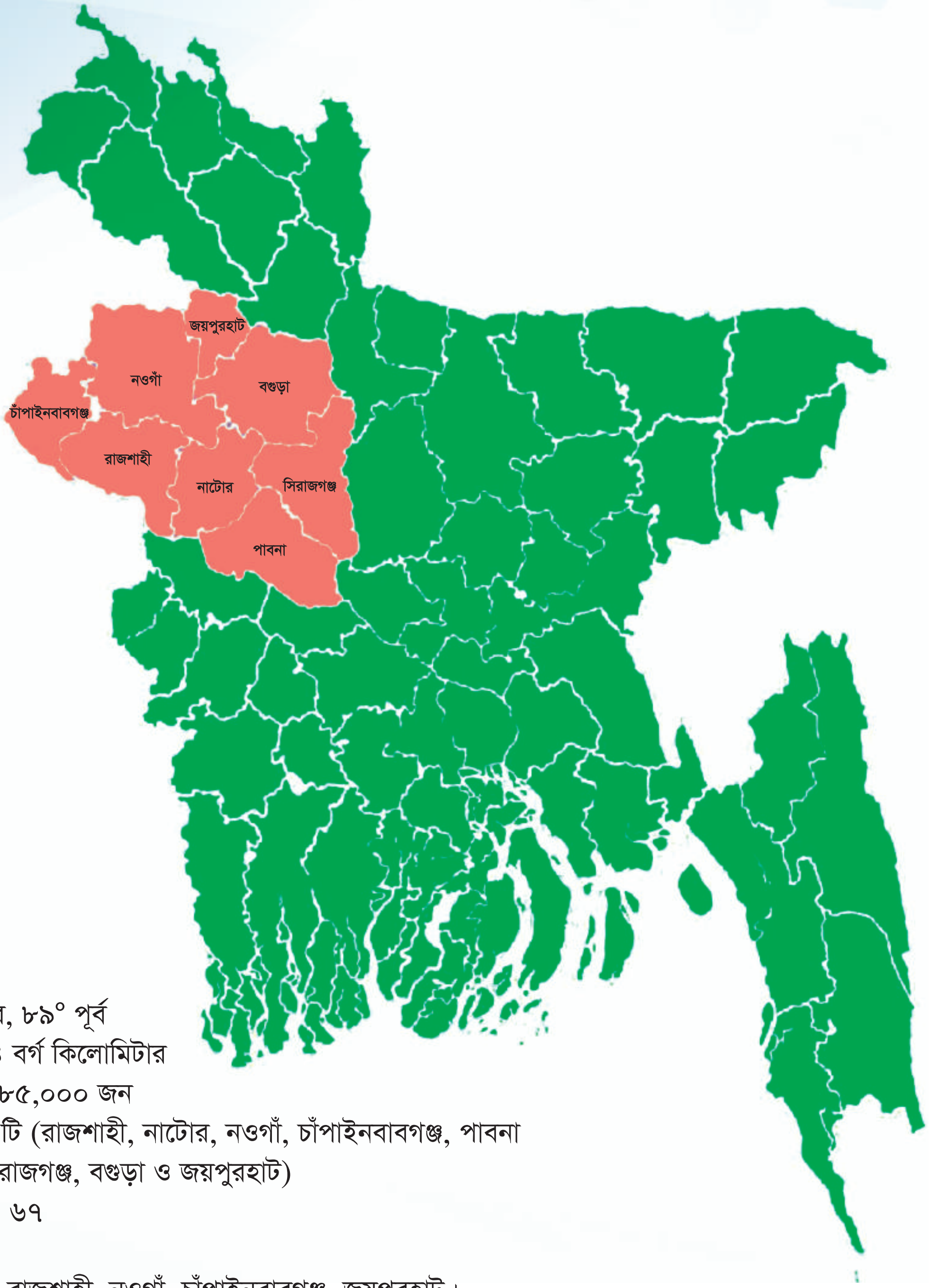

স্থানাঙ্ক: ২৫° উত্তর, ৮৯° পূর্ব
আয়তন: ১৮,১৫৪ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা: ১,৮৪,৮৫,০০০ জন
জেলার সংখ্যা: ৮ টি (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট)
উপজেলার সংখ্যা: ৬৭
থানার সংখ্যা: ৭১
সীমান্তবর্তী জেলা: রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট।
প্রধান প্রধান নদী: পদ্মা, যমুনা, আত্রাই, মহানন্দা, করোতোয়া
দর্শনীয় স্থানসমূহ: মহাস্থানগড়, গোকুল মেধ, পাহাড়পুর, ছোট সোনামসজিদ, পুঠিয়া রাজবাড়ী, উত্তরা গণভবন, বাঘা মসজিদ, দিব্যক জয়স্তম্ভ, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, চলনবিল ইত্যাদি।
কর্মরত পুলিশ সদস্যের সংখ্যা: ১২৫০০ প্রায় (প্রতি ৭৪০ জন জনসংখ্যার বিপরীতে একজন পুলিশ)
অপরাধ প্রবণতা: প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে ১.২৪ (বার্ষিক)

রেঞ্জ ডিআইজি অফিস, রাজশাহী এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ঃ

জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন, বিপিএম, পিপিএম
ডিআইজি রাজশাহী রেঞ্জ,
বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী

জনাব জয়দেব কুমার ভদ্র, বিপিএম
অতিরিক্ত ডিআইজি (প্রশাসন ও অর্থ),
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব টিএম মোজাহিদুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম
অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্ অ্যান্ড ক্রাইম),
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
পুলিশ সুপার (মিডিয়া অ্যান্ড ক্রাইম এ্যানালাইসিস),
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
পুলিশ সুপার (এস্টেট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার),
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম
পুলিশ সুপার (ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্রসিকিউশন)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া
পুলিশ সুপার (অপারেশনস্ অ্যান্ড ট্রাফিক)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোঃ শফিউল আযম সরকার
সহকারি পুলিশ সুপার (স্টাফ অফিসার টু ডিআইজি)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোঃ আফজাল হোসেন খান
সহকারি পুলিশ সুপার (অপারেশনস্ অ্যান্ড ক্রাইম)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব আরজুমা আকতার
সহকারি পুলিশ সুপার (এস্টেট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোঃ হাসান হাফিজুর রহমান
নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (ক্রাইম এ্যানালাইসিস শাখা)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান
নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (ফোর্স শাখা)
রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রাজশাহী

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় রাজশাহীতে কর্মরত অফিসার-ফোর্স

রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয় রাজশাহীতে কর্মরত সিভিল স্টাফগণ

“আইজিপি মহোদয়ের রাজশাহী রেঞ্জ সফর”

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সনের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা গর্বিত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। সেই ১৮৬১ সাল থেকে পুলিশের পথচলা শুরু। সময়ের বিবর্তনে অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে পুলিশ। দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে দেশ ও জনগণের যে কোন প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করা এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় ও বাস্তবতার নিরীখে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পুলিশ। সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে দেশ ও জাতির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশি সেবাকে সহজে পৌঁছে দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন সময়ে অনেক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিগত দশ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ পুলিশের একের পর এক অনেক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

বর্তমানে জনগণের সেবা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাংলাদেশ পুলিশের এক সময়োপযোগী ও দূরদর্শী উদ্যোগ হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাধুনিক অপারেশনাল গিয়ার চালুকরণ। এটি বাংলাদেশ পুলিশের পরিবর্তনের ধারায় এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে পরিচিত হবে। মুজিববর্ষে দেশের আধুনিক পুলিশকে এক প্রতিচ্ছবি দেখাতেই সর্বাধুনিক এই অপারেশনাল গিয়ার প্রর্বতন করা হয়েছে। ঔপনবেশিক উত্তরাধিকার ধারা থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের অপরাপর আধুনিক দেশের ন্যায় বাংলাদেশ পুলিশকে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। দেশের সাধারণ মানুষকে পুলিশি সেবা প্রদান অনেক সহজসাধ্য হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনবান্ধব পুলিশ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে জনগণের পুলিশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। পুলিশি সেবা সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। বিট পুলিশিং কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের প্রত্যাশিত সেবা দ্রুত প্রদান করতে হবে। তাহলে যে কোন ধরনের অপরাধ দমন করা সহজ হবে এবং পুলিশ হয়ে উঠবে জনবান্ধব। পুলিশের আচরণ ও মনোভাবে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। কারো সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। যদি আমরা আমাদের আচার-আচরণ পরিবর্তন না করতে পারি তাহলে যা কিছু করি না কেন এগুলা কোনটাই কাজে আসবে না। পুলিশের কাছে আসে সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ মানুষ। চরম বিপদ মূহুর্তে যখন একজন মানুষ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এর আশ্রয় পায় না তখন সেই বিপন্ন মানুষটি আমাদের কাছে আসে। তাই তাকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করতে হবে। পুলিশকে হতে হবে সাধারণ মানুষের ভরসার প্রথম আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশে অনেকে অনেক পেশায় নিয়োজিত আছে। কিন্তু একটা পেশার ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষ খুবই সংবেদনশীল। সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। পুলিশকে একজন মানুষ তার স্বপ্নের সেবাপ্রদানকারী হিসেবে দেখতে চায়। থানার অফিসার ইনচার্জদের হতে হবে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মত। যদি কোন মানুষের কোন ধরনের সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন ঘটে সেটি বলবৎ করার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের। রাষ্ট্র ও সংবিধান যে ক্ষমতায় আমাদের ক্ষমতায়িত করেছে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। দেশের মানুষকে তার প্রত্যাশিত আইনগত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশ হবে আরো বেশি আধুনিক ও জনবান্ধব-এ প্রত্যাশা পূরণে আমাদের কাজ করতে হবে আন্তরিকতা, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সাথে।

পর্যন্ত আইজিপি মহোদয়ের রাজশাহী রেঞ্জ সফরকালীন দেওয়া বক্তব্য কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে।